ধর্ষণ নাকি ধর্ষক, কে এগিয়ে?

বিনয় দত্ত

সম্প্রতি সিলেট এমসি কলেজ এলাকায় এক দম্পতি ঘুরতে গিয়েছিলেন। তারা নতুন বিবাহিত। ঘোরাঘুরির এক পর্যায়ে স্বামী সিগারেট খাওয়ার জন্য কলেজের গেইটের বাইরে বের হন। এ সময় ৬-৭ জন যুবক তরুণীকে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে গিয়ে এমসি কলেজ ছাত্রাবাস এলাকায় ধর্ষণ করে। এরা সবাই ছাত্রলীগের কর্মী। অভিযুক্তরা হলেন এমসি কলেজ ছাত্রলীগকর্মী সাইফুর রহমান, কলেজের ইংরেজি বিভাগের মাস্টার্সের ছাত্র শাহ মাহবুবুর রহমান রনি, মাহফুজুর রহমান মাছুম, অর্জুন লস্কর ও বহিরাগত ছাত্রলীগ কর্মী রবিউল এবং তারেক আহমদ। (বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২০)

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলায় এক নারীকে বিবস্ত্র করে নির্যাতন করা হয়। ঘটনার এক মাস পর সেই ঘটনার ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়া হয়। এতে প্রতিবাদে ফেটে পড়ে সবাই। বিবস্ত্র নারীকে কুপ্রস্তাব দেয় তারা। তিনি রাজি হন নি।

এরপর তারা যেভাবে সেই নারীর যৌনাঙ্গে আঘাত করেছে তা অবর্ণনীয়। ২০২০ সালের ২ সেপ্টেম্বর ঘটনা ঘটার পর স্থানীয় জনপ্রতিনিধি তা জানার পরও কোনো ব্যবস্থা নেয় নি। (বিবিসি বাংলা, ৫ অক্টোবর ২০২০)

এটি ২০২০ সালের সর্বোচ্চ আলোচিত দুটি ঘটনা। এইরকম ঘটনা অহরহ প্রতিনিয়ত ঘটছে। তার ক'টি আমরা জানছি? প্রতিদিন কতভাবেই নারী-শিশু ধর্ষিত হচ্ছে, কতজন ধর্ষকের গল্প আমরা জানছি? খুব কম। গণমাধ্যমে যা প্রচারিত হচ্ছে তা-ই আমরা জানছি। যাদের নাম গণমাধ্যমে প্রচারিত হচ্ছে শুধু কি তারাই ধর্ষক? এর বাইরে আর কেউই নেই? প্রশ্নটা শুনে খানিকটা ধাক্কা লাগছে? এই প্রশ্নের মধ্যেই আসলে উত্তর লুকিয়ে আছে।

মো. মিজানুর রহমান থাকেন হস্তীশুণ্ড, উজিরপুর, বরিশাল। তিনি জাতীয় দৈনিকের চিঠিপত্র বিভাগে জানতে চেয়েছেন, 'ধর্ষণ কমবে না?' এর উত্তর সরল। কিন্তু উত্তর দেবে কে? রাষ্ট্র, প্রশাসন, সরকার, রাজনৈতিক নেতা কে দেবে এর উত্তর? কেউ দেবে না। এই উত্তর সবারই জানা। কিন্তু কেউই এর উত্তর দিতে পারছে না। শুধু বরিশালের মিজান নয়, এরকম অসংখ্য মানুষের প্রশ্ন 'ধর্ষণ কমবে না?' এর উত্তর হলো, না।

নারী-শিশু বিষয়ে লিখতে গিয়ে আমাকে অনেক বিষয় সম্পর্কে জানতে হয়। সেই জানা থেকে এবং নিজের গবেষণা থেকে বলছি, বাংলাদেশে ধর্ষণ বন্ধ হওয়ার যে প্রক্রিয়া সে প্রক্রিয়াতে

আমরা যাচ্ছি না। আমরা আশেপাশে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলছি এবং তা নিয়ে মেতে উঠছি। এই মেতে ওঠার মধ্যে আমরা কালক্ষেপণ করি। কালক্ষেপণ হতে হতে একসময় আমরা ভুলে যাই। কয়েকদিন, কয়েক সপ্তাহ, কয়েক মাস পর নতুন করে কেউ ধর্ষণের শিকার হন, তখন আমরা আবার মেতে উঠি। এই হচ্ছে আমাদের চরিত্র।

২.

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের জন্ম হয়। বাংলাদেশের জন্ম থেকে ২০২০ পর্যন্ত মোট কতজন নারী-শিশু ধর্ষিত হয়েছেন তার হিসাব কেউ রেখেছেন? রাখেন নি, কারণ প্রয়োজন পড়ে নি। সেই সংখ্যাটা এত বিশাল যে, সেই সংখ্যা শোনার মতো মানসিক স্থিরতা আমাদের নেই। কিন্তু যেই বিষয়টা এত বছরে তৈরি হওয়া প্রয়োজন ছিল তা হলো, ধর্ষকের মনস্তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করা। 'ধর্ষকের মনস্তত্ত্ব' শব্দটার মধ্যে একটা ভয়ানক বিস্ময় লুকিয়ে আছে, তাই তো? হ্যাঁ। শব্দটা আসলেই 'ধর্ষকের মনস্তত্ত্ব'। এই বিষয়ে গবেষণা না থাকায় আমাদের নির্ভর করতে হয় বাইরের তথ্য-উপাত্ত বা ক্রিমিনাল সাইকোলজি বা ধর্ষকদের মনস্তত্ত্বের উদাহরণ বা রেফারেন্সের ওপর। শুরুতেই জানতে চেয়েছিলাম, যাদের নাম গণমাধ্যমে প্রচারিত হচ্ছে শুধু কি তারাই ধর্ষক? এর বাইরে আর কেউই নেই? বিষয়টা একটু পরিষ্কার করি।

নিকোলাস গ্রোথ, পুরো নাম A. Nicholas Groth। ইনি একজন মনোবিজ্ঞানী। যৌন নিপীড়ন বিষয়ে তাঁর কয়েকটা বিখ্যাত বই আছে। মধুমিতা পান্ডে নামের একজন ভারতীয় গবেষক আছেন, যিনি অপরাধবিজ্ঞান বিষয়ে কাজ করেন। সেই বিষয়ের একটা অংশ হলো ক্রিমিনাল সাইকোলজি। তা নিয়ে তিনি গবেষণা করেছেন। আরো সুনির্দিষ্ট করে বললে, তিনি ধর্ষকদের নিয়ে কাজ করেন।

২০১২ সালের ডিসেম্বরে ভারতে ডাক্তারি পড়ুয়া একজন শিক্ষার্থী ধর্ষণের শিকার হয়। তার নাম দেয়া হয় নির্ভয়া। সেই নির্ভয়া ধর্ষণে পুরো ভারত ফুঁসে উঠেছিল। তার পরের বছর অর্থাৎ ২০১৩ সালে নয়াদিল্লির তিহার কারাগারে থাকা ধর্ষকদের সাক্ষাৎকার নেওয়া শুরু করেন তিনি। বিভিন্ন কারাগারে ঘুরে তিনি ১০০ জন ধর্ষকের সাক্ষাৎকার নেন।

এই দীর্ঘ কর্মযজ্ঞ তিনি সম্পন্ন করেন তার পিএইচডি-র জন্য। ২০১৮ সালের আগস্টে ফার্স্টপোস্ট অনলাইন ম্যাগাজিনের এক সাক্ষাৎকারে মধুমিতা পান্ডে ধর্ষকদের মনস্তত্ত্ব নিয়ে কথা বলেন। মধুমিতা বলেন, 'ধর্ষণকারীদের পশু বলা, জানোয়ার বলা, দানব বলা সমস্যার সমাধান নয়। তাতে আমরা সমাজের ভালো মানুষ, আমরা রেপের জন্য দায়ী নই, আর ওরা হলো জন্তু-জানোয়ার, ওরা দায়ী'– এরকম একটা সহজ দায়মুক্তির ধারণা সমাজে চলে আসে।

ধর্ষণ একটা লম্বা সুতা, যার এক প্রান্তে আছে ধর্ষণ নামের ক্রিয়াটি। কিন্তু এটা শুরু হয়েছে সমাজের বিভিন্ন অনুষঙ্গ থেকে; যেমন 'নারীকে অধস্তন হিসেবে দেখা, ইভটিজিং, নারীবিদ্বেষী কৌতুক, নারীকে তাচ্ছিল্য করে কথা বলা, হয়রানি'– এইসব কম গুরুত্বপূর্ণ উপাদানই শেষমেষ ধর্ষণে গিয়ে পৌঁছায়।'

বিষয়টা খুব লক্ষণীয়। গবেষক মধুমিতা পান্ডে যেসব উপাদানের কথা বলেছেন তার প্রতিটি বিষয় আমাদের দেশে হয়। বরং 'তাচ্ছিল্য' করে কথা বলাটা সবচেয়ে বেশি হয় এবং সবাই এই কাজটি সজ্ঞানে করতে চাই। আমি এর প্রমাণ দেব একটু পরে।

এই সকল উপাদানই একটির সাথে আরেকটি সম্পর্কিত। একটি ধাপ পার করে আরেকটি ধাপে পা রেখে মানুষের সাহস বাড়ে। সাহস বাড়লে মানুষ অপরাধমূলক কাজ করে বা অপরাধের সাথে লিপ্ত হতে চায়। এই চাওয়াটাই একসময় ধর্ষণের মতো ভয়ানক ঘটনা ঘটায়।

৩.

২০২০ সালের ১২ অক্টোবর বাংলাদেশে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন সংশোধন করে ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ডের বিধান যোগ করার সিদ্ধান্ত অনুমোদন করে মন্ত্রিসভা। (বিবিসি, ১৪ অক্টোবর ২০২০)

এটি আমার কাছে বিস্ময়কর মনে হয় নি। কারণটা একটু ভেঙে বলি। ধর্ষণের শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ডের বিধান দেয়া সপ্তম দেশ হলো বাংলাদেশ। এর আগে ভারত, পাকিস্তান, সৌদি আরব, ইরান, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও চীন-এর নাম রয়েছে।

ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তির বিরোধিতা করছে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল। তাদের বক্তব্য হলো, 'চরম শাস্তি সহিংসতাকে অব্যাহত রাখে, তা প্রতিরোধ করে না।'

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল-এর সাথে আমার ভাবনা এবং লেখার খানিকটা মিল রয়েছে। ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড যখন দেয়া হবে, তখন সেই অপরাধ হয়ত খানিকটা কমবে। কিন্তু ধর্ষণ প্রমাণিত করার যে দীর্ঘ প্রক্রিয়া, সেই প্রক্রিয়ায় কয়েকটি বিষয় ঘটবে।

প্রথমত, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আইনি প্রক্রিয়া এত জটিল যে, ধর্ষক প্রমাণ করতেই বছরের পর বছর সময় লেগে যাবে। ফলে তথ্য-প্রমাণ হারিয়ে যাবে এবং ধর্ষক জামিনে বের হয়ে যাবে।

দ্বিতীয়ত, ধর্ষকামী পুরুষ বা ধর্ষকদের মানসিকতা পরিবর্তিত হবে না।

তৃতীয়ত, মানসিকতার পরিবর্তন না হলে পুনরায় ধর্ষণ হবে এবং ঘটনা চাপা দেওয়ার সর্বোচ্চ চেষ্টা চালানো হবে।

চতুর্থত, সামাজিক শিক্ষা বা নৈতিক শিক্ষার বিষয়টি অবহেলিত থেকে যাচ্ছে, ফলে একটা শূন্যতা তৈরি হচ্ছে।

পঞ্চমত, ধর্ষিতা নারী-শিশু এবং তার পরিবার সবচেয়ে বেশি ভোগান্তির শিকার হবে।

ষষ্ঠত, আদতে শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ডের বিধান রাখা হলেও তার ফলপ্রসূতা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়।

ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারের তথ্যানুযায়ী, ভুক্তভোগীরা ২৬ ভাগ ঘটনায় আইনের সহায়তা নেয়, যার মধ্যে শাস্তি দেয়া হয় ০.৩৭ ভাগের। অর্থাৎ ২৬ ভাগে শাস্তি মাত্র ০.৩৭ ভাগ। (বিবিসি, ১৪ অক্টোবর ২০২০)। এতেই প্রমাণিত হয় শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড কতটা কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

৪.

লেখার শুরুতেই মনোবিজ্ঞানী নিকোলাস গ্রোথ-এর কথা বলেছিলাম। গ্রোথ ধর্ষকদের টাইপ বা প্রকারভেদ করেছেন তিনটি, যা গ্রোথ টাইপোলজি নামে পরিচিত।

১। Power Rapist (ক্ষমতান্ধ ধর্ষক)

২। Anger Rapist (ক্রোধান্ধ ধর্ষক)

৩। Sadistic Rapist (ধর্ষকামী ধর্ষক)

এই তিন টাইপের ধর্ষকের আলাদা আলাদা ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন। এইসব ব্যাখ্যা দেশের মানবাধিকার সংস্থা থেকে শুরু করে গবেষণা সংস্থা সবারই জানা জরুরি। তাতে ধর্ষকদের মনস্তত্ত্ব নিয়ে বিশদে গবেষণা হবে এবং আমাদের লেখার প্রয়োজনে তা কাজে লাগবে।

Power Rapist (ক্ষমতান্ধ ধর্ষক)

এই ধরনের ধর্ষকরা নিজেদের সবদিক থেকে ক্ষমতাবান হিসেবে প্রমাণ করতে চায় এবং করে। তারা সবসময় ক্ষমতাকে তাদের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে। সে ক্ষমতা নিজের কি না তা দেখবার বিষয় নয়। ব্যক্তিজীবনেও তারা সবসময় ক্ষমতার ফ্যান্টাসিতে ভোগে। ক্ষমতার ফ্যান্টাসিতে থেকে তারা ধর্ষণের মতো কঠিন অপরাধ করেও তা ক্ষমতা দিয়ে মুছে ফেলতে চায়। যে কোনো কিছুতেই তাদের ধর্ষক প্রবৃত্তি জেগে ওঠে বা তারা জাগিয়ে তোলে। ধারণা করা হয়, এই ধরনের ধর্ষক আমাদের দেশে বেশি।

যেমন, বনানীর রেইনট্রি হোটেলে দুই ছাত্রীর ধর্ষণের মামলার মূল আসামি আপন জুয়েলার্সের মালিকের ছেলে সাফাত আহমেদ, বগুড়ায় ছাত্রীকে ধর্ষণের পর মারপিট এবং নির্যাতনের পর ধর্ষিতা ও তার মায়ের মাথা ন্যাড়া করার ঘটনায় অভিযুক্ত তুফান সরকার– এরা সবাই মূলত পাওয়ার রেপিস্ট।

Anger Rapist (ক্রোধান্ধ ধর্ষক)

এই ধরনের ধর্ষকরা ক্রোধ বা রাগকে ধর্ষণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। প্রতিশোধের আশায়, কোনোকিছু নিষেধ করেছে তা সহ্য করতে না পেরে, অন্যায়কে ন্যায় ভেবে তারা যে কোনো সময়, যে কোনো ইস্যুতে ধর্ষক হয়ে ওঠে বা তাদের ধর্ষক প্রবৃত্তি জাগিয়ে তোলে। ছোটবেলায় তারা অবহেলিত, নিগৃহীত থাকলেও বড় হতে হতে তাদের মধ্যে সেই অবহেলা ক্রোধে রূপ নেয়। অনেকটা সিনেমার মতো, তুই ছোটবেলায় আমাকে এই করেছিলি আমি এখন এই করব। কার ওপর করছে তা বিষয় নয়, কী করছে তাই বিষয়। তাদের ধর্ষক মন, মানুষ খুন করতেও দ্বিধা করে না।

যেমন, নোয়াখালীর সুবর্ণচরে গৃহবধূ ধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্ত আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক রুহুল আমিন, গেণ্ডারিয়ায় ছোট আয়েশাকে ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনায় অভিযুক্ত নাহিদ– এরা সবাই মূলত অ্যাঙ্গার রেপিস্ট।

Sadistic Rapist (ধর্ষকামী ধর্ষক)

এই ধরনের ধর্ষকরা শুধু যে ধর্ষণ করে তা নয়, ধর্ষণের পর বিভিন্ন অদ্ভুত কারণে তারা ভিকটিমের ওপর প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠে। ভিকটিম বা ধর্ষণের শিকারকে কষ্ট দেওয়ার মধ্যে তারা এক ধরনের পাশবিক সুখ খুঁজে পায়। এতে করে ধর্ষণের শিকার বা ভিকটিম সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন।

যেমন, দিনাজপুরের পার্বতীপুরে ৫ বছরের শিশুকে ধর্ষণের পর অবর্ণনীয় পাশবিক নির্যাতন করা হয়, এ ধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্ত সাইফুল ইসলাম, ফেনীর সোনাগাজীর মাদ্রাসাছাত্রী নুসরাত জাহান রাফি মাদ্রাসার অধ্যক্ষ সিরাজ উদ-দৌলার নারীলিপ্সার শিকার। এরা হলো স্যাডিস্টিক রেপিস্ট।

নিকোলাস গ্রোথ বর্ণিত ধরনের বাইরে আরেক ধরনের ধর্ষকের কথা জানা যায়, এরা হলো The Power-Reassurance Rapist or Opportunity Rapist (দ্য পাউয়ার-রিজ্যুরেন্স রেপিস্ট বা অপরচিউনিটি রেপিস্ট)। এরা সবচেয়ে ভয়ানক। এরা সাধারণ মানুষের মধ্যে থাকে, কিন্তু তাদের চেনা যায় না। কখনো কখনো এরা সবার বিশ্বাস নিয়েও থাকে। মাদ্রাসার

শিক্ষক থেকে শুরু করে বাসের হেল্পার, ড্রাইভার বা সিরিয়াল রেপিস্ট সবাই এই টাইপের মধ্যে পড়ে।

যেমন, নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার বায়তুল হুদা ক্যাডেট মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মাওলানা আল-আমিন ১২ জন শিশু ছাত্রীকে ধর্ষণের কথা স্বীকার করেছে। নেত্রকোনার কেন্দুয়া উপজেলায় মাদ্রাসার অধ্যক্ষ আবুল খায়ের বেলালী ৮ জন শিশুকে ধর্ষণের কথা স্বীকার করেছে। রাজধানীর দক্ষিণখানের একটি মসজিদের ইমাম ইদ্রিস আহম্মেদ ৫ জন নারীকে ধর্ষণ এবং ১০ থেকে ১২ জন ছাত্রকে বলাৎকার করার কথা স্বীকার করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ধর্ষণে অভিযুক্ত মজনুর কথাও এখানে বলা যায়– এরা সবাই দ্য পাউয়ার-রিজ্যুরেন্স রেপিস্ট বা অপরচিউনিটি রেপিস্ট।

এই সকল প্রকার ধর্ষক সমাজের অংশ হিসেবে থাকে, তাদের কখনো চেনা যায়, কখনো চেনা যায় না। সুযোগমতো তাদের ধর্ষক প্রবৃত্তি তারা জাগিয়ে তোলে।

৫.

এইবার গবেষক মধুমিতা পান্ডের সেই 'তাচ্ছিল্য' করা সম্পর্কে বলা যাক। কয়েকদিন আগে আমার বাসার পাশে ওয়াজ মাহফিল হয়েছে। সেই ওয়াজে বক্তা জোর গলায় চিৎকার করে বলছিলেন– এইসব বেলেল্লাপনা বন্ধ করতে হবে। আর সবাই তাতে সায় দিচ্ছিল। আমি গভীর মনযোগ দিয়ে বক্তব্য শুনলাম। যেখানে ধর্মীয় কথা বলার কথা সেই জায়গায় একজন নারীর বেশভূষা, চালচলন, আচার-ব্যবহার এইসব নিয়ে বক্তা অনেক বিশাল সময় জুড়ে চিৎকার করে বক্তব্য দিলেন। সেই বক্তব্য সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনেছে।

আমার প্রশ্ন হলো, এই বক্তা কি নারীর বেশভূষা, চালচলন, আচার-ব্যবহার বিশ্লেষণ করবার ও তা নিয়ে বলবার জন্য এখানে বসেছে? শুধু এখানে নয়, সব জায়গায়ই ওয়াজে নারীর বেশভূষা, চালচলন ও আচার-ব্যবহার নিয়ে কথা বলা হয় ও তাদের হেয় করা হয়। কেন? একজন নারী কী পোশাক পরবে, কীভাবে চলবে তা একান্তই তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। সেই ব্যক্তিগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা স্পষ্টতই সীমা লঙ্ঘন। একজন নারীকে তাচ্ছিল্য করে কথা বলবার অধিকার তাদের কে দিয়েছে? কেউ দেয় নি।

তাচ্ছিল্য করে কথা বললে কী হয়? এতে করে বাকিরা যারা শোনে, তারা কেউই আর নারীর প্রতি শ্রদ্ধা বা সম্মান দেখায় না। ফলে নারীর প্রতি তাদের মধ্যে এক ধরনের বিতৃষ্ণা, ঘৃণা, ক্ষোভ, ক্রোধ জেগে ওঠে। উদ্বেগজনক ব্যাপার হলো, এই ঘৃণা, ক্ষোভ, ক্রোধ সংক্রমিত করে অন্যদের। এইভাবে নিজের অজান্তেই এরা ধর্ষক তৈরি করে।

আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)-এর তথ্য অনুযায়ী, ২০২০ সালের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৯ মাসে দেশে মোট ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ৯৭৫টি। এ সময়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে জুন মাসে, ১৭৬টি। ওই মাসে দলগত ধর্ষণের ঘটনা ঘটে ৩৯টি।

আমি মনে করি, প্রমাণিত হওয়া ধর্ষকদের যদি গণমাধ্যমে বারবার দেখানো হয়, যদি ধর্ষকদের কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করা হয়, যদি ধর্ষকদের মনস্তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করা হয়, যদি প্রতিটি ছেলেসন্তানের ক্ষেত্রে নারীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখানোর বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়, যদি ওয়াজে নারীদের তাচ্ছিল্য করে কথা বলা বন্ধ করা হয় তাহলে ধর্ষণ কমতে বাধ্য।

বিনয় দত্ত কথাসাহিত্যিক ও সাংবাদিক। benoydutta.writer@gmail.com